

শিক্ষা নিয়ে সাহসী কিছু চিন্তা হোক

খো লা হা ও যা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

একটি প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল 'আমাদের সন্তান, আমাদের শিক্ষা' নামের একটি অনুষ্ঠান প্রচার করছে, যা চলবে পুরো এক বছর। অনুষ্ঠানটি যারা পরিকল্পনা করেছেন, তাদের একজন আমাকে জানানো, আমাদের সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে একটি উদ্বোধন থেকেই উদ্যোগটি তাঁরা নিয়েছেন। উদ্বোধনটি প্রধানত শিক্ষার মান নিয়ে, শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিয়ে, শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ে এবং যে শিক্ষা আমাদের সন্তানেরা পাচ্ছে তা ভবিষ্যতের জন্য তাদের তৈরি করছে কি না, তা নিয়ে।

এই অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি চ্যানেলের সংবাদকর্মীরা যাচ্ছেন বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে, অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসায় কী পড়ানো হচ্ছে অথবা হচ্ছে না তার ওপর, তদন্ত করছেন ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর পাঠ্যবই ও শিক্ষণ-পদ্ধতি নিয়ে। এ পর্যন্ত এ রকম দুটি প্রতিবেদন দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। এর একটি ছিল একটি মাদ্রাসা নিয়ে, অন্যটি ঢাকার অভিজাত পাড়াগুলোর ইংরেজি মাধ্যমের কিছু স্কুল নিয়ে। শিক্ষার সামাজিক (ও অর্থনৈতিক) মান বিচারে এই দুই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তফাটটা, যাকে বলে আকাশ-পাতাল; তবু কিছু অভূত মিল আছে তাদের মধ্যে। উভয় প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা অনুপস্থিত, উভয় প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতি পরিত্যক্ত। ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলো ইহজাগতিকতার শিক্ষা দেয়; ধরে নেওয়া হয় এগুলো থেকে যারা পাস করে বেরোবে, তাদের জন্য বিশ্বের যেকোনো দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকবে এবং তারা দেশ-বিদেশের চাকরিবাজারে একটা ভালো জায়গা করে নিতে পারবে। মাদ্রাসাগুলো শিক্ষা দেয় পরজাগতিকতা—এরা শিক্ষার্থীদের দুনিয়াদারির তালিম দিতে উৎসাহী নয়।

তবে উপরিউক্ত চ্যানেলের প্রতিবেদন থেকে যা জানা গেল, তাতে মনে হলো, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলো বিশ্বের জন্য তাদের শিক্ষার্থীদের তৈরি করতে গিয়ে মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে নিয়ে যাচ্ছে; তারা সাংস্কৃতিকভাবে নিরালম্ব ও উন্মূল হয়ে পড়ছে। আর মাদ্রাসাগুলো মাতৃভাষার চর্চা ও স্বদেশপ্রেম থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে আরেকভাবে তাদের উন্মূল ও নিঃস্রব করছে। অথচ শিক্ষার মূল আদর্শ শুধু জ্ঞানদান নয়, বরং শিক্ষার্থীদের ভেতরে নৈতিকতা, ন্যায়নৈতিকতা, সুনীতি, দেশপ্রেম ও মানবিকতার বোধ তৈরি করে তাদের সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু কিছু তথ্য শিখিয়ে দেওয়া নয়; বরং তথ্যকে জ্ঞানে এবং জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত করার দক্ষতা তৈরি করা। এটি যত দিন করা সম্ভব না হবে, তত দিন শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করাটা কোনো প্রতিষ্ঠান, সমাজ, শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হবে না।

আমার এই লেখার এই জায়গায় এসে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। ওই টেলিভিশন চ্যানেলটি যেমন কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দূর্বলতার জন্য সব ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল বা মাদ্রাসাকে নিয়ে ঢালাওভাবে কোনো মন্তব্য করছে না বা তাদের অভিযুক্তও



শিক্ষা বিষয়ে এখনো আমাদের চিন্তা একটা পুরোনো বাক্সেই রয়ে গেছে

করছে না, আমিও তেমনি করছি না। আমি জানি, অনেক ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল আছে, যেগুলোতে মাতৃভাষার ওপর জোর দেওয়া হয়, নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। তেমনি অনেক মাদ্রাসাও আছে (বিশেষ করে আলিয়া মাদ্রাসা), যেগুলোতে বাংলা ও বাংলাদেশের ইতিহাস গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়। ঢাকায় তাদের দেশ-এর সবচেয়ে ভালো মক্কায়ন আমি করতে দেখেছি একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে। কিন্তু আমার উদ্বেগের কারণটি হচ্ছে এই, যদি এক লাখ, এমনকি এক হাজার তরুণ শিক্ষার্থীও উন্নত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়; নিজের দেশ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে তারা অজ্ঞ থেকে যায়; যদি মাতৃভাষার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়; তবে তা হবে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আমাকে ব্যথিত করে—নানান পাবলিক পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হয়। যারা শিক্ষার একটা পর্যায়ে অফেরতযোগ্যভাবে ঝরে পড়ে। যারা শিক্ষার সুযোগ থেকে সারা জীবন বঞ্চিতই থাকে, তাদের মেধা ও সৃজনশীলতা, নানান সক্ষমতা আর সেবা থেকে দেশটা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত থাকে। তারাও নিজেদের নিয়ে সমস্যায় ভোগে; হতাশা আর সংস্কৃতির তাদের সঙ্গী হয় অথবা নিজেদের তারা অক্ষম ভাবে। অথচ শিক্ষার মহাসড়কে তারা একটা জায়গা করে নিতে পারলে তাদের যাত্রার ধ্বনি জগৎকেও শোনাতে পারত।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব ১৬ ফুটবল দলের মেয়েরা একটা প্রতিযোগিতায় খেলল। এরা উঠে এসেছে বাংলাদেশের নানা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে—কলসিপুর অথবা রাঙামাটি অথবা গাইবান্ধা থেকে। দু-তিন বছর আগে এদের অনেকে ফুটবল বস্তুটা কী, এর ওজন কী বা কী দিয়ে তা তৈরি হয়, তাও হয়তো জানত না। অথচ স্কুলের শিক্ষক, পরিবারের মানুষ এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ কোচ মিলে কী অসাধ্যটাই তাদের দিয়ে সাধন করিয়ে নিলেন। এই মেয়েদের গল্পটা আমাদের একটা জিনিস শেখায়—সবাই পারে। কেউ কেউ পারে, তা নয়—সবাই পারে। যদি

আমাদের শিক্ষা হতো এই মেয়েদের ফুটবল শেখার মতো হাতে-কলমে চর্চাভিত্তিক, আনন্দঘন ও স্থিরলক্ষ্য; যদি শিক্ষকেরা তাদের কোচের মতো দক্ষ, সহমর্মী ও বন্ধুবৎসল হতেন; তবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই একটা অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য তৈরি হতে পারত। এদের গল্পটি আমাদের জানায়, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উদ্যমের যোগ হলে, শিক্ষার সঙ্গে প্রশিক্ষণের যোগ হলে, পরিশ্রমের সঙ্গে আনন্দের যোগ হলে সবই সম্ভব।

চার দশকেরও বেশি সময়ের শিক্ষকতায় আমি তরুণদের সঙ্গে একটি জীবন কাটিয়েছিলাম। প্রতিদিন তাদের সঙ্গেই চলছে আমার গুঁঠাবসা। আমি তাদের সজাবনার জায়গাগুলো ধরতে পারি, তাদের সমস্যাগুলোও বুঝতে পারি। গুরুত্বপূর্ণ জীবনের শিক্ষার রকমফের কী প্রভাব তাদের পরবর্তী শিক্ষায় রেখেছে, তা আন্দাজ করতে পারি। আমি সব সময় বলি, ভালো শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আমি বিশ্বাস করি, জীবনের গুরুত্ব যদি বইয়ের সঙ্গে আমাদের সন্তানদের একটা সখা তৈরি করা যায়, তাদের ভেতরে সৃজনশীলতা আর কল্পনার বিস্তার ঘটানো যায়, সংস্কৃতির সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা তাদের ভেতরে তৈরি করা যায়, সুনীতি আর মূল্যবোধের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা করিয়ে দেওয়া যায় আর তাদের শিক্ষাজীবন আনন্দঘন করে দেওয়া যায়, তাহলে তারা কোনো দিন নিরালম্ব অথবা নিঃস্রব হবে না। তারা মাদক অথবা উগ্রবাদের গ্রাসে পড়বে না, তারা পথচ্যুত হবে না। অথচ তাদের শিক্ষা নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা এখনো সেকেলেই রয়ে গেল। আমরা কিছু সনদ এবং চাকরিবাজারের সম্মতিপত্রকেই জীবনের সেরা ধন বিবেচনা করে তাদের একটা শিক্ষাগলি ধরেই তাড়িয়ে নিচ্ছি। অথচ গলিটার শেষ পর্যন্ত একটা কানাগলি—মহাসড়ক তো দূরের কথা, তা নিয়ে আমরা ভাবছি না।

শিক্ষা বিষয়ে এখনো আমাদের চিন্তা একটা পুরোনো বাক্সেই রয়ে গেছে, যে বাক্সে বৈষম্যচিন্তা, শ্রেণি আর বিভাজনটা প্রধান। ওই টিভি চ্যানেলকে ধন্যবাদ, তার সংবাদকর্মীরা

নানা প্রতিবেদনে মাদ্রাসাশিক্ষার্থীদের সঙ্গেও কথা বলেছেন, তাদের কথা শুনতে চেয়েছেন। মাদ্রাসার এই শিক্ষার্থীরা আমাদের শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা-আলোচনায় অবহেলিত। কিন্তু তারাও যে আমাদের সম্পদ, এ কথাটিও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তাদের ভেতর থেকেও কত বিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ, উদ্যোক্তা অথবা সৃষ্টিশীল লেখক বেরিয়ে এসে দেশের জন্য অবদান রাখতে পারে, অথচ আমরা তাদের একটা গভীর মধ্যে ফেলে তাদের সেই সব সজাবনা থেকে দূরেই রেখে যাচ্ছি। দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, পারিবারিক দায়দায়িত্ব অথবা নানান অক্ষমতা যে শিশুদের শিক্ষাবঞ্চিত রাখছে, তাদের দিকেও নজর দিতে হবে। কুড়ি বছর আগে কেউ কি ভেবেছিল, আমরা নিজেদের পয়সায় পদ্মা সেতু বানাতে পারব? তাহলে?

দুই.

শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে—সেটি হতে হবে এক নম্বর রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সব শিক্ষার্থীর জন্য অভিন্ন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করাটা হতে হবে একটা সামাজিক চুক্তিও। যদি মেধাবী শিক্ষকেরা প্রাথমিক আর মাধ্যমিক স্কুলে না পড়াতে যান, সুশিক্ষা কীভাবে নিশ্চিত হবে? আমি নিশ্চিত, বেতন-ভাতা ভালো হলে, শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলে, শিক্ষকদের ক্রমাগত প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকলে, তাঁদের প্রতি সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি করা গেলে (নারায়ণগঞ্জের সেই শিক্ষকের কথা কি মনে পড়ে, অথবা এক সরকারি কর্মকর্তার পা ছুঁয়ে এক শিক্ষককে ক্ষমা প্রার্থনায় বাধ্য করার ছবিটি?) ভালো শিক্ষক পাওয়া মোটেও কঠিন হবে না। কিন্তু পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পিঠ থেকে বইয়ের বোঝা তুলে নিতে হবে—বই থাকবে স্কুলে। সারা দিন স্কুলে পড়ে আমাদের সন্তানেরা বাড়ি গিয়ে আনন্দ করবে। তারা শ্রেণিকক্ষে পড়বে আনন্দ নিয়ে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত তাদের পরীক্ষা দিতে হবে না—বরং অনেক সৃষ্টিশীল পদ্ধতিতে তাদের মূল্যায়ন করা হবে। তারা স্কুলে খেলাধুলা করবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে, প্রকৃত পাঠে বের হবে, জীবনদক্ষতা শিখবে, নিয়মানুবর্তিতাসহ নানা মূল্যবোধ শিখবে। এবং হ্যাঁ, শ্রেণিকক্ষে সব পড়া ভালোভাবে শেষ হবে বলে তারা মোটেও কোটিং ক্লাসে যাবে না। কোটিং বাণিজ্য একটা অভিশাপ। এটিকে সহায়তা করছে দুটি অকারণ পাবলিক পরীক্ষা—পঞ্চম আর অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা। এ দুই পরীক্ষা আমাদের সন্তানদের পীড়িত করছে, তাদের তোতা পাখিতে পরিণত করছে। জানি না, কবে এ দুটি পরীক্ষার ভার থেকে তারা মুক্ত হবে।

তিন.

যেসব দেশ, জাতি শিক্ষা নিয়ে সাহসী চিন্তা করেছে—শত প্রতিকূলতার মধ্যে কিউবা যেমন, অথবা দক্ষিণ কোরিয়া—সাহসী বিনিয়োগ করেছে, সাহসী নীতি করেছে, সাহসী নিষ্ঠা দেখিয়েছে, তারা তাদের সময়টাকে নিজেদের করতলে নিয়ে গেছে।

একাত্তরে আমরা যে সাহস দেখিয়েছি, তার কিছুটা শিক্ষা নিয়ে দেখালে সময় আমাদের করতলে এসে ধরা দেবে। আমাদের সন্তানদের জন্য এটি হবে একটা সত্যিকার উত্তরাধিকার।

● সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : কথাসাহিত্যিক। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।